পথপ্রদর্শনকারী কিতাব ও সাহায্যকারী তরবারী

শায়খ মুজাহিদ ইবরাহীম ইবনে সুলাইমান আর-রুবাইশ
রহিমাহুল্লাহ

পথপ্রদর্শনকারী কিতাব ও সাহায্যকারী তরবারী

শায়খ মুজাহিদ ইবরাহীম ইবনে সুলাইমান আর-রুবাইশ

প্রকাশনায়: আল-মালাহিম মিডিয়া

রজব ১৪৩৪ হি: মুতাবেক মে ২০১৩ খৃ:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"তোমরা কি হাজিদেরকে পানি পান করানো ও মসজিদ নির্মাণ করাকে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য মনে করছো, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর নিকট তারা সমান নয়। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তার প্রশংসা করছি, তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের অন্তরের যাবতীয় অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথপ্রদর্শনকারী কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তার সাথে কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তার বান্দা ও তার রাসূল। আল্লাহ তার প্রতি এবং তার সাহাবা ও পরিবারবর্গের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন!

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তার সাথে সৃষ্টি করেছেন হক-বাতিলের যুদ্ধ। যুদ্ধ তাদের মাঝে পালাক্রমে আবর্তিত হবে। প্রত্যেক দলই অপর দলকে আঘাত করবে। কিন্তু সর্বশেষ বিজয় হবে মুত্তাকিদের।

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ

"যদি আল্লাহ মানুষের একদলকে আরেক দলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী অশান্তিময় হয়ে যেত।"

আল্লাহ তা'আলা হকের মধ্যে রেখেছেন এমন নূর, যা সকল সংশয়ের কোমর ভেঙ্গে দেয় এবং সকল অন্ধকারের আবরণ জালিয়ে দেয়। যে ই হক পেতে চায়, সে তার নূরের মাধ্যমে তাকে চিনে নিতে পারবে। শর্ত হল সে তার জন্য একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করবে।

এটি আল্লাহর তা'আলার একটি হেকমত যে, হকের বিজয় প্রথমে হয় দলিলের মাধ্যমে, আর বাতিলের হয় শক্তির মাধ্যমে। আল্লাহ চাইলে তারা পরস্পরে লড়াই করত না। কিন্তু আল্লাহ যা চান, তাই করেন এবং তোমরা যা জান না, তিনি তা জানেন। ফলে সাধারন মানুষের বড় দলটি বাতিলের আনুগত্য করে। কেননা বাতিলের শক্তি ও সংখ্যা তাদেরকে অন্ধ করে দেয়।

অত:পর যখন সেচ্ছাচার চরম আকার ধারণ করে এবং সবরের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন হকপন্থিগণ এমন দৃঢ়তা দেখান, যা দেখাতে বাতিলরা ব্যর্থ হয়। যেন আল্লাহ ভাল থেকে মন্দকে পৃথক করে নিতে পারেন। আর তখনই আল্লাহ তা'আলা নিজ সাহায্য অবতীর্ণ করেন। সংশয় পোষণকারীরা তখন দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায় এবং দলে দলে মানুষ হকের পথে প্রবেশ করে।

অনেক মানুষের অবস্থা হল: যদিও হকের শক্তি ও তার নিখুত আদর্শ তাদেরকে মুগ্ধ করে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বাতিল শক্তিশালী থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেয় না। কারণ বাতিলের শক্তি তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে বাঁধা হয়ে থাকে। একারণেই আল্লাহ তা'আলা কিতাবও নাযিল করেছেন এবং লোহাও নাযিল করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড যুদ্ধ শক্তি। কিতাব পথপ্রদর্শন করবে আর তরবারী সাহায্য করবে।

ফলে কিতাবের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানী হকের পথে সাড়া দিবে আর তরবারীর মাধ্যমে মুসলমানদের এমন একটি সংগঠন (রাষ্ট্র) তৈরী হবে, যা তাদেরকে রক্ষা করবে এবং বাতিলের শক্তি চূর্ণ করবে। মানুষের অন্তর থেকে তার ভয় দূর হয়ে যাবে। তখন যে যে ইসলামে প্রবেশ করতে চাইবে, প্রবেশ করতে পারবে আর যে ইসলামী শাসনের আনুগত্য মেনে স্বীয় দ্বীনের উপর থাকতে চায়, সে থাকতে পারবে। তার এই স্বাধীনতা থাকবে। তবে শর্ত হল নিজ হাতে ছোট হয়ে জিযিয়া করতে হবে।

এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যাবত না ফেৎনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"

এ কারণেই ইলম ও কিতালের (যুদ্ধের) মাঝে সম্পর্ক হল পূর্ণাঙ্গতার সম্পর্ক। যে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ ইলম ছাড়া যুদ্ধের পরিণতি হয় বিকৃতি। আর যে ইলমকে রক্ষ করার জন্য শক্তি থাকে না, তাতে বাতিল চেপে বসে। ফলে তাকে যেভাবে ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করে।

হক যদিও উপরে থাকে, কিন্তু তা ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালি হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত ধারালো তরবারী তার উভয় পার্শ্বকে বেষ্টন করে না রাখে।

দ্বীনে ইসলামের মধ্যে এই বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট। সুতরাং মুসলমানগণ এমনটা চিন্তা করতে পারে না যে, ইলম অন্বেষণ করার অর্থ হল জিহাদ থেকে বসে থাকা বা জিহাদ ইলমের সাথে সাঙ্ঘর্ষিক।

উলামাগণ জিহাদের ময়দান থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারেন না। নবী সা: এর আদর্শই এর প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। কারণ তিনি ছিলেন বীর এবং ভয়ের স্থানে সবচেয়ে অগ্রগামী। এর প্রমাণ হিসাবে তার এই বাণীই যথেষ্ট- তার প্রতি আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোক:

> *"সেই সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি চাই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত হই, অত:পর আবার যুদ্ধ করি, আবার নিহত হই, অত:পর আবার যুদ্ধ করে আবার নিহত হই।"*

তিনি জিহাদকে সময় নষ্ট করা বা কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্তা থাকা মনে করতেন না। বরং তিনি এটাকে সময় ব্যয় করার সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ মনে করতেন। তাই তিনি বলেছেন:

"সেই সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের জন্য কষ্টকর না হয়ে যেত, তাহলে আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী কোন একটি বাহিনী থেকেও পিছনে বসে থাকতাম না। কিন্তু আমি নিজেও তাদের সকলকে বাহন দেওয়ার মত সামর্থ্য রাখি না আর তারাও সামর্থবান নয়। আর আমার থেকে পিছনে থেকে যেতে তাদের কষ্ট হয়।"

রাসূলুল্লাহ সা: তার সাহাবাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন এবং তাদেরকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করতেন। তিনি একথা বলে তার সাহাবাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠাতে পিছিয়ে থাকতেন না যে, এটা মূল্যবান ব্যক্তিদেরকে নষ্ট করে দিবে!

বরং তিনি তাদেরকে এই কাজেই নিয়োজিত করতেন এবং এর জন্যই তাদেরকে প্রস্তুত করতেন। একজন ব্যক্তিকেও যুদ্ধে পাঠানোর ব্যাপারে কার্পণ্য করেননি। কারণ, কিভাবে তিনি তাদেরকে কল্যাণ থেকে বাঁধা দিতে পারেন?!

বীরে মাউনার ঘটনা থেকেও এ ব্যাপারে দলিল গ্রহণ করা যায়, সেখানে তিনি তার সত্তরজন সাহাবাকে পাঠান, যারা সকলে ক্বারি ছিলেন। ওহুদ যদ্ধের কয়েক মাস পরে তিনি তাদেরকে পাঠান। পরে সংবাদ আসলো, তাদের সকলকে হত্যা করা হয়েছে।

আমাদের যামানার কেউ যদি সেখানে থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই বলত: আপনি কি তাদের কারো শিক্ষা সমাপ্ত করিয়েছেন যে, এসকল লোকগুলোকে এত ঝুকিপূর্ণ কাজে পাঠিয়ে দিলেন?

তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সা: কারী, ফকীহ সহ সকল সাহাবীকে বের হয়ে যেতে বললেন। সেখানে কোন আলেম বা তালিবুল ইলমকে পৃথক করেননি।

রাসূলুল্লাহ সা: এর নিকট মুসলমানদের মধ্যে আবু বকর রা: থেকে অধিক প্রিয় কেউ ছিল না, তা সত্ত্বেও তিনি তাকেও যুদ্ধে পাঠাতে কার্পণ্য করেননি। বরং অন্যান্যদের মত তাকেও পাঠালেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সা: এর সকল যুদ্ধসমূহে রাসূল সা: এর সাথে বের হতেন। তিনি

তাকে কখনো আমির হিসাবে, কখনো মামুর হিসাবে, কখনো কমান্ডার হিসাবে এবং কখনো সৈনিক হিসাবে পাঠিয়েছেন। তিনি তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার উর্ধ্বে মনে করতেন না।

যায়দ ইবনে সাবিতের প্রতি রাসূলুল্লাহ সা: এর ভালবাসা ছিল অনেক বেশি, তা সত্বেও তিনি তাকে যুদ্ধে-বিগ্রহে পাঠাতেন। বরং তিনি মূতার যুদ্ধে তাকে আমির বানিয়ে পাঠিয়েছেন। এমন ঝুকিপূর্ণ যুদ্ধে, যেই যুদ্ধ থেকে তার ফিরে না আসারই প্রবল সম্ভাবনা ছিল। আর ঘটেছেও তাই।

শুধু তাই নয়, তার সাথে জাফর ইবনে আবু তালিবকে পাঠিয়েছেন, অথচ তিনি সবে মাত্র হাবশা থেকে এসেছেন। তার মহান ভালবাসাই তাকে উদ্ধুদ্ধ করেছে, তাদেরকে সেই লাভজনক ব্যবসায় পাঠানোর জন্য, যা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সা: থেকে এই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে শিখেছিলেন। তাই তারাও যুদ্ধে ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন। তারা নিজেদের মসজিদ বা পাঠশালায় অবস্থান করে শুধু যুদ্ধের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করা ও তার পৃষ্ঠপোষকতা করার মাঝেই ক্ষান্ত থাকেননি। বরং তারা মসজিদের মধ্যে দরস দান করতেন, আর যখনই কোন ফরিয়াদির আওয়ায শুনতেন, সাথে সাথেই আল্লাহর আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে সেই দিকে উড়ে যেতেন।

এ কারণে আপনি তাদের জীবনী পাঠ করলে দেখতে পাবেন, বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আলোচনা করে তাদের মর্যাদার প্রতীক নির্ণয় করা হয়েছে। অনেক সময় একথা বলে শুরু করা হয় যে, তিনি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহ করেছেন। আর সেই ঘটনাটি উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করা হয়, যাতে তিনি শহীদ হয়েছেন।

রিদ্দার যুদ্ধসমূহে অনেক সাহাবা নিহত হয়েছেন। যাদের সাথে অনেক কুরআনের বাহকও শহীদ হয়েছেন। যে ঘটনা তাদেরকে কুরআন সংকলন করতে উদ্ধুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এটা তাদেরকে, কুরআনের বাহকদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরিয়ে রাখতে উদ্ধুদ্ধ করেনি। এব্যাপারে তাদের কর্মপন্থাগুলো অনুসন্ধান করে দেখুন, তার তালিকা অনেক দীর্ঘ হবে।

তাই যেমনিভাবে তারা রাতের দরবেশ ছিলেন, তেমনি দিনের বীরযোদ্ধা ছিলেন। আর তাদের আদর্শের উপরই পরবর্তী উম্মাতও চলেছে। সে সময় সকল মুমিনগণ জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন, তারা কাউকে পৃথক করতেন না। তারা জিহাদকে মর্যাদা ও বিনিময়ের কারণ মনে করতেন। আলেম-জাহেল নির্বিশেষে সকলেই তাতে প্রতিযোগীতা করত।

কেউ জীবনী গ্রন্থ অনুসন্ধান করলে এমন অনেক আলেমদের আলোচনা পাবে, যারা ইলম ও জিহাদ, দুটিকে একত্র করেছিলেন। আর যেসকল উলামাগণ জিহাদ করতেন না, তারা স্বীকার করতেন যে, তাদের মহা ফযীলত ছুটে গিয়েছে। অনুসন্ধান করলে এমন উলামাদের জীবনীর তালিকা অনেক দীর্ঘ হবে। আমরা এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েক জনের আলোচনা পেশ করছি:

তারিক ইবনে শিহাব রহ:

তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন: আমি আবু বকর ও ওমর রা: এর খেলাফত আমলে ৩০ বা (অন্য বর্ণনায়) ৪০ এর অধিক গাওয়া ও সারিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছি। ইমাম যাহাবী রহ: তার ব্যাপারে বলেন: তিনি অধিক জিহাদ করা সত্বেও উলামাদের মধ্যে গণ্য হতেন।

কা'ব আল-আহবার রহ:

তিনি ইহুদী ধর্মের পন্ডিত ছিলেন। অত:পর ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবাদের থেকে সুন্নাহর শিক্ষা গ্রহণ করেন। ওসমান রা: এর খেলাফত আমলে যুদ্ধে গমন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ:

ইমাম যাহাবী রহ: সিয়ারু আলমিন নুবালায় তার ব্যাপারে বলেন: ইমাম, শায়খুল ইসলাম, স্বীয় যামানার আলেম, সমকালীন মুত্তাকীদের আমির, হাফেজ, গাজী, অন্যতম মনীষী।

তার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী জনৈক ব্যক্তি বলেন:

“যখন উভয় দল পরস্পর কাতারবদ্ধ হল, জনৈক রোমী বের হয়ে আসল। সে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাল। তখন এক ব্যক্তি তার দিকে এগিয়ে গেল। উক্ত রোমী তার উপর কঠিন আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলল।

এভাবে ৬ জন মুসলমান শহীদ হয়ে গেল। তখন রোমী ব্যক্তি দুই সারির মাঝে দাঁড়িয়ে গর্ব করতে করতে তার সাথে লড়ার জন্য কাউকে আসার আহ্বান জানাল। কেউ বের হচ্ছিল না।

তখন ইবনুল মুবারক রহ: বের হলেন। তিনি কিছুক্ষণ ঐ পাহলোয়ানের সাথে লড়াই করে তাকে হত্যা করে ফেললেন। অত:পর আবার কাউকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানলেন।

আরেক পালোয়ান এগিয়ে আসল। তিনি তাকেও হত্যা করে ফেললেন। এমনকি ৬ জন পালোয়ান হত্যা করে ফেললেন। অত:পর কাউকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। কিন্তু মনে হল যেন শত্রুপক্ষ ভয় পেল। তাই তিনি আপন স্থানে ফিরে এলেন।

ইমাম আহমাদ রহ: বলেন:

> আমি ইবনুল মুবারক থেকে হাদিস শুনতে গেলাম। কিন্তু আমি তাকে পেলাম না। তিনি বাগদাদে এসেছিলেন, অত:পর সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধে চলে গেছেন, তাই আমি তাকে দেখলাম না।

তার একটি ঘটনা আছে, তিনি সীমান্ত এলাকা থেকে ফুযাইল ইবনে ইয়াযের নিকট একটি কবিতা লিখে পাঠান, উক্ত কবিতার একটি পঙক্তি ছিল:

কারো গাল চোখের অশ্রুতে রঞ্জিত হয়,

আর আমাদের বুক আমাদের রক্তে রঞ্জিত হয়।

ফুযাইল ইবনে ইয়ায যখন তা পাঠ করলেন, তার দু’চোখ অশ্রুতে প্লাবিত হল। তিনি বললেন: আবু আব্দুর রহমান সত্য বলেছে। সে আমার কল্যাণ কামনা করেছে। অত:পর যে তার নিকট পত্র পৌঁছিয়েছিল, তিনি তাকে বললেন: তুমি কি হাদিস লিখ? লোকটি বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তাহলে তুমি আবু আব্দুর রহমানের পত্র আমার নিকট বহন করে নিয়ে আসার বিনিময় স্বরূপ এই হাদিসটি লিখ। এই বলে ফুযাইল ইবনে ইয়ায নিজ সনদে আবু হুরায়রা রা: থেকে নিম্নোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন:

“জনৈক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল শিখান, যার দ্বারা আমি আল্লাহর পথের মুজাহিদদের সমান সওয়াব লাভ করবো। রাসূলুল্লাহ সা: বললেন: তুমি কি পারবে, ধারাবাহিকভাবে নামায পড়বে, তাতে কোন বিরতি দিবে না এবং ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখবে, তাতে কোন বিরতি দিবে না!!?

লোকটি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি এটা পারা থেকে অনেক দুর্বল। নবী সা: বললেন: সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি তুমি এটা করতে পারতেও, তথাপি তুমি আল্লাহর পথের মুজাহিদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারতে না। তুমি কি জান না, মুজাহিদের ঘোড়া যে দীর্ঘ পথ চলে, এর জন্যও তাকে অনেক নেকি দেওয়া হয়।”

এমনিভাবে সহীহের সংকলক ইমাম বুখারী রহ: এরও সীমান্ত যুদ্ধে অংশ ছিল। সীমান্ত যুদ্ধে যারা তার সাথে ছিলেন, এমন জনৈক লোক দেখলেন, তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছেন। সে এতে আশ্চর্য বোধ করল।

তিনি বললেন: আজকে আমরা অনেক ক্লান্ত হয়েছি। আর এটা হল একটি যুদ্ধ কবলিত এলাকা। আমি শত্রুদের পক্ষ থেকে কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। তাই আমি চাচ্ছি, কিছু বিশ্রাম নিয়ে প্রস্তুত হতে। আমি চাই, হঠাৎ করে শত্রু আমাদের উপর আক্রমণ করে দিলে যেন আমরা যুদ্ধ শুরু করতে পারি।

উক্ত ব্যক্তি আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি নিক্ষেপের প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন। ফলে আমি তার দীর্ঘ সাহচর্যের মধ্যে মাত্র ২ বার ব্যতিত কখনো তার তীর লক্ষভ্রষ্ট হতে দেখিনি। সব সময় তিনি লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হতেন। কখনো ব্যর্থ হতেন না।

যে সকল উলামাগণ ইলম ও জিহাদকে এক সাথে জমা করেছেন, তাদের মধ্যে আরো আছেন: শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ:। তিনি ছিলেন দু:সাহসী, বাহাদুর। মানুষকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করতেন এবং লড়াইয়ের ময়দানে সবার আগে থাকতেন।

৬৯৯ হিজরীতে দামেশকের গভর্ণর সীমান্ত অঞ্চলের কিছু লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে বের হয়েছিলেন। কারণ তাদের আকীদা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শায়খুল ইসলামও তাদের সাথে বের হলেন। তিনি তাদের নেতৃবৃন্দের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তাদেরকে তাওবা করতে বললেন এবং তারা যে সকল মাল ছিনিয়ে নিয়েছে, সেগুলো ফিরিয়ে দিতে বললেন।

ঐ মাসেই শহরে ঘোষণা দেওয়া হল, মানুষ যেন তাদের অস্ত্রগুলো দোকানে ঝুলিয়ে রেখে তীর নিক্ষেপণ শিখে। ফলে টার্গেট নির্ণয় করার চর্চা শুরু হয়ে গেল। মানুষ তাদের অস্ত্রগুলো বাজারে ঝুলিয়ে রাখল। কাযী আদেশ করল: যেন নিক্ষেপণ শিখার জন্য টার্গেট নির্ণয় চর্চা মাদ্রাসাগুলোতে হয় এবং ফুকাহাগণও নিক্ষেপণ শিখে, যাতে শত্রু এসে গেলে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকতে পারে।

৭০০ হিজরীর সফর মাসে সংবাদ আসল, তাতাররা শাম অভিমুখে আসছে। সকল মানুষ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তখন শায়খুল ইসলাম জামে মসজিদে স্বীয় মজলিসে বসে মানুষকে জিহাদের জন্য উদ্ধুদ্ধ করতে লাগলেন। তাদেরকে পলায়নের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করলেন এবং তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরজ ফতওয়া দিলেন।

শায়খ রহ: শহরের গভর্ণর ও তার সেনাবাহিনীর সাথে দামেশকের বাইরে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাদেরকে সাহস দিলেন, তাদের দুর্বলতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলেন এবং তাদের অন্তরে উদ্যমতা সৃষ্টি করলেন। অত:পর তাদের সাথেই রাত্রি কাটালেন। অত:পর মিশরে গেলেন মিশরের সেনাবাহিনীকে সিরিয়ায় সাহায্য করার জন্য উদ্ধুদ্ধ করার জন্য। তাদেরকে বললেন: যদি ধরা হয় যে, আপনারা সিরিয়ার শাসক নন, এমতাবস্থায় সিরিয়াবাসীরা আপনাদের নিকট সাহায্য চায়, তখনও আপনাদের উপর তাদেরকে সাহায্য করা ফরজ। আর যখন আপনারা সেখানকার শাসক, তখন বিষয়টা কতটা জরুরী?! তারা আপনাদের প্রজা, আপনারা তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন।

৭০২ হিজরীতে যখন তাতাররা দামেশকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আসল, তখন তিনি মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্ধুদ্ধ করেছেন, তিনি আমিরদেরকে উৎসাহিত করতেন। লোকজন যখন তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে এই দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলতে লাগলো যে, তারা তো বাহ্যত ইসলাম প্রকাশ করছে, তখন তিনি তাদের জন্য হুকুম বর্ণনা করলেন: তোমরা যদি আমাকেও ওই দিক থেকে আসতে দেখ, আর আমার মাথায় কুরআন শরীফ থাকে, তাহলে তোমরা আমাকেও হত্যা করে ফেলবে। তখন মানুষ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্ধুদ্ধ হয়ে গেল।

শায়খ রহ: শুধু শহরে লোকদের সাথে থেকেই ক্ষান্ত হলেন না; বরং তিনি স্বশরীরে যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার জন্য বের হয়ে পড়লেন। অনেকে ধারণা করল, তিনি হয়ত পলায়ন করতে বের হয়েছেন। তাই তারা তাকে ভর্ৎসনা করল। তারা বলল: আপনি আমাদেরকে কাপুরুষতা দেখাতে নিষেধ করলেন, আর আপনি নিজে ভাগছেন! তখন তিনি তাদের কোন জবাব দিলেন না।

যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সুলতান তাকে তার সাথে থাকার আবেদন করল। তিনি বললেন: সুন্নাহ হল প্রত্যেকে নিজ কওমের পতাকাতলে থাকবে। আর আমরা শামের বাহিনী, আমরা তাদের সাথেই থাকবো। যখন যুদ্ধ উপস্থিত হল, উভয় দল পরস্পরকে দেখতে লাগলো। জনৈক আমির জানায় যে, তখন তিনি তার নিকট এসে বললেন: আমাকে মৃত্যুর স্থানে দাঁড় করান। উক্ত আমির বলেন: আমি তাকে এমন স্থানে শত্রুর সাথে মোকাবেলা করার জন্য নিয়ে গেলাম, যেখানে শত্রু স্রোতের ন্যায় নেমে আসছিল। আচ্ছন্ন করা ধুলোবালির নিচ থেকে তাদের তরবারীগুলো চমকাচ্ছিল।

অত:পর আমি তাকে বললাম: হে শায়খ! এই যে মৃত্যুর স্থান। আর এই যে শত্রু ধুলোবালির নিচ থেকে এগিয়ে আসছে। তাই আপনি যা চান করতে পারেন। উক্ত আমির বলেন: তখন তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি উচু করলেন, তার চোখকে উপরে উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে তার দু' ঠোট নাড়ালেন অত:পর উঠে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন।

৭১২ হিজরীতে সংবাদ পৌঁছলো, তাতাররা সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আসছে। তখন শাসক বের হলেন, তার সাথে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ:ও বের হলেন। কিন্তু তাতাররা সিরিয়ার নিকটবর্তী পৌঁছে আবার ফিরে গেল।

মুজাহিদ উলামাদের মধ্যে আরো রয়েছেন মুহিউদ্দীন আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আশ-শাফেয়ী, আদ-দিময়াতী, যিনি ইবনুন নুহহাস নামে পরিচিত। তিনি আমাদের যামানার মত একটি যামানায় জীবন কাটিয়েছেন, তবে তার যামানাটা এর থেকে একটু ভাল ছিল। মোগলরা শামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচলানা করে এবং ক্রুসেডাররা মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তখন শায়খ রহ: এর ভূমিকা কি ছিল??

তিনি জিহাদের উপর উদ্ধুদ্ধ করে ও তার হুকুম-আহকাম বর্ণনা করে তার প্রসিদ্ধ কিতাবটি লিখেন: مشارع الأشوق إلي مصارع العشاق ومثير الغرام إلي دار السلام

শায়খ রহ: শুধু কিতাব লিখে এবং নিজে নিভৃতে পাঠশালায় থেকেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি জিহাদের আহ্বানকারী ও তাতে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। ৮১৪ হিজরীতে খৃষ্টানরা মিশরের কোন একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আক্রমণ করলো। তখন দিময়াতবাসী তাদের ভাইদেরকে সাহায্য করার জন্য বের হল, তাদের সর্বাগ্রে ছিলেন শায়খ রহ:। অত:পর পশ্চাদপসরণ না করে সম্মুখে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

আল্লাহ ইবনুন নুহহাসের প্রতি রহম করুন! ‘আদ-দাওউল লামি’ কিতাবের লেখক তার ব্যাপারে বলেন: তিনি ভাল কাজে প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন। অখ্যাতিকে প্রাধান্য দিতে। নিজের পরিচয় দ্বারা অহংকার করতেন না। অনেক সময় যারা তাকে চেনে না, তারা তাকে সাধারণ লোক মনে করত। অথচ তার ছিল উত্তম গঠন, সুন্দর দাড়ি। তিনি ছিলেন মধ্যম গড়নের খাট। জিহাদ ও সীমান্ত প্রহরায় অনেক বেশি অংশগ্রহণ করতেন। ফলে শহীদ হন।

মুজাহিদ আলেমগণের মধ্যে আরো রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ:। যখন মুহাম্মদের সেনাবহিনী দারিয়াতে যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন তিনি শুধু যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি একজন বাহাদুরের মত যুদ্ধও করেছেন। তিনি বলতেন: সম্মানের সাথে যমীনের গর্ভও লাঞ্ছনার সাথে যমীনের উপরিভাগ থেকে উত্তম।

যখন তার পুত্র تيسير العزيز الحميد কিতাবের লেখক সুলাইমান নিহত হলেন, তখন সেনাবাহিনীর কমান্ডার তাকে তিরস্কার করার জন্য তার নিকট গেল। সে বলল: তোমার পুত্র সুলাইমান আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে!

তিনি একজন মুমিনের স্বাভাবিক সন্তুষ্টির সাথে জবাব দিলেন: তুমি যদি তাকে হত্যা নাও করতো, তথাপি সে মৃত্যু বরণ করত।

তাদের মধ্যে রয়েছেন শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান, ফাতহুল মাযীদ কিতাবের লেখক। যুদ্ধের ময়দানগুলোতে তিনি নিজে উপস্থিত হতেন। যখন দারিয়া অবরুদ্ধ হল, তখন তিনিও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন এবং উক্ত যুদ্ধে তার পুত্র নিহত হল। আর পরাজিত হওয়ার পর তাকে মিশরে নির্বাসন দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে নজদী দাওয়াতের ইমামদের ঘটনাবলী অনুসন্ধান করে দেখুন, তা অনেক দীর্ঘ হবে। যে তাদের কিতাবসমূহ পাঠ করেছে, তার নিকট বিষয়টা স্পষ্ট।

তারা প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত প্রসারের জন্য যুদ্ধ করেছেন। তারপর শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করল, তখন তা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন। নজদী দাওয়াত যতটা বিস্তার লাভ করেছে, তা শুধু এই জন্য যে, তা একটি পথপ্রদর্শক কিতাব ও একটি সাহায্যকারী তরবারী পেয়েছে।

সমকালীনদের মধ্যে ইলম ও জিহাদের মাঝে সমন্বয়কারীদের আলোচনা করা হলে সর্বাগ্রে থাকবেন শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম, আনওয়ার শা’বান ইউসুফ আল উয়াইরী, আবু ইউনুস আশ-শামী, আবু ইয়াহইয়া আল-লিবী, আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবী, খালিদ আল হুসাইনান প্রমুখ আলেমগণ। আল্লাহ সকলের প্রতি রহম করুন! আর সর্বাদাই উম্মতের মাঝে কল্যাণের অবশিষ্ঠাংশ থেকে যাবে।

আমি ঐ সকল উলামাদেরকে অবজ্ঞা করছি না, যারা ওযরের কারণে আটকে পড়েছে বা মাযুর হিসবে ব্যাখ্যা করে বসে আছেন, কিন্তু তাওহীদের আলোচনা করতে, জিহাদের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করতে, মুজাহিদদেরকে সাহায্য করতে এবং তাদের পক্ষে জবাব দিতে চেষ্টায় ত্রুটি

করছেন না। বরং আলোচনা হচ্ছে ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে, যারা বসে থাকার সাথে সাথে জিহাদ থেকে বাঁধা দিচ্ছে, মুজাহিদদেরকে কটাক্ষ করছে।

আমাদের যামানায় এদের সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে। বরং তাদেরই নেতৃত্ব চলছে। ক্রুসেডাররা তাদের কারণে আনন্দিত হচ্ছে। কারণ আমেরিকানরা এই ধরণের লোকদের কিছু কথা আমাদের নিকট নিয়ে এসে আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে।

আল্লাহ ইবনু নুহহাসের প্রতি রহম করুন! تنبيه الغافلين عن أعمال المجاهدين কিতাবে লিখেন, “আমাদের যামানায় তো লোভ লালসা উলামাদের যবানকে আটকে রেখেছে। তাই তারা চুপ করে আছে। তাদের কথাগুলো তাদের কাজকে সমর্থন করে না। তারা যদি আল্লাহর সাথে সত্যবাদীতা দেখাতো, তাহলে এটা তাদের জন্যই কল্যাণকর হত।

তাই আমরা যখন প্রজাদের বিকৃতির প্রতি লক্ষ্য করি, আমরা দেখতে পাই, তার কারণ হচ্ছে শাসকদের বিকৃতি। আর যখন শাসকদের বিকৃতির প্রতি লক্ষ্য করি, তখন দেখি তার কারণ হচ্ছে উলামা ও নেককারদের বিকৃতি। আর যখন উলামা ও নেককারদের বিকৃতির প্রতি লক্ষ্য করি, তখন দেখি, তার কারণ হচ্ছে তাদের অন্তরে ঝেকে বসা সম্পদ ও প্রতিপত্তির ভালবাসা, সুখ্যাতির আকর্ষণ, কথার মান রক্ষা হওয়ার আগ্রহ, মাখলুকের সাথে শৈথিল্য এবং কথায় ও কাজে নিয়তের গরমিল।

তাদের কেউ যখন কোন প্রজার অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যায়, তখন সেটাই পারে না। তাহলে বাদশাদের প্রতিবাদ করতে পারবে কিভাবে··· কিভাবে নিজেকে ধ্বংসাত্মক স্থানে দাঁড় করাতে পারবে··· কিভাবে তার অন্তরে ঝেকে বসা সম্পদ ও পদের লোভ ছুটে যাওয়ার স্থানে দাঁড়াতে পারববে...।” শায়খ রহ: এর কথাটি শেষ হল।

এক সময় শাসকগণ আলেমদের ইলমের কাছে নত ছিল। ফলে আল্লাহ তাদের মাধ্যমে দ্বীনকে সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকে দ্বীনের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু যখন উলামাগণ শাসকদের দান-দক্ষিণার মুখাপেক্ষী হয়ে গেল, তখন তারা লাঞ্ছিত হল এবং সেই আমানত নষ্ট করতে লাগলো, যার ব্যাপারে তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

এমনি ছিলেন তারা। তাদের জীবনটাই ছিল জিহাদের সাথে যুক্ত। অথচ তাদের বেশির ভাগ অবস্থায় জিহাদ ছিল “জিহাদে তলব” বা আক্রমণাত্মক। প্রতিরোধমূলক ছিল না।

এ হল সামান্য কয়েকটি উদাহরণ। আমি শুধু ঐ সকল আলেমদের উদাহরণ পেশ করতে চেয়েছিলাম, যারা স্বশরীরে জিহাদ করেছিলেন। পক্ষান্তরে জিহাদের ব্যাপারে তাদের আলোচনা, তার ব্যাপারে উদ্ধুদ্ধ করা এবং জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হতে না পারার কারণে তাদের আফসোস করার ঘটনা তো এর থেকে আরো অনেক বেশি। তাদের মধ্যে উপবিষ্টরা নিজেদের উপর আফসোস করতেন এবং যারা বের হয়েছেন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন।

কিন্তু তাদের পরে এমন একদল অযোগ্য উত্তরসূরী আসলো, যারা তালিবুল ইলমকে মুজাহিদের চেয়ে উচ্চস্তরের মনে করতে লাগল এবং জিহাদকে গণ্য করতে লাগল এমন লোকদের কাজ, যাদের কোন কাজ নেই। তারা যখন তালিবুল ইলমকে জিহাদে লিপ্ত হতে দেখেন, তখন তার জন্য মায়াকান্না করতে থাকেন এবং সে জিহাদের কাজে জীবনটা নষ্ট করে দিচ্ছে বলে তার জন্য আফসোস করতে থাকে।

অনেক আলিম ও তালিবুল ইলমদের নিকট জিহাদ হয়ে গেছে সময় নষ্ট করার কাজ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধকবলিত এলাকায় আসে, অত:পর যখন প্রশিক্ষণের কঠিন কষ্ট এবং যুদ্ধের বিপদাপদ দেখে এবং তাকে দেশে বসে কিতাব মুতালা করার আরামের সাথে তুলনা করে, তখন উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিম্নটা গ্রহণ করে যেখান থেকে এসেছিল আবার সেখানেই ফিরে যায়।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় আছে, যে অন্তত একথা বলে যে, আমরা উভয় দলই কল্যাণের মধ্যে আছি।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। যাতে নিজের জন্য বসে থাকার একট বৈধতা মিলে যায়। তার অবস্থা হল সেই (আ'রাবীর) গ্রাম্য ব্যক্তির অবস্থার মত, যে হিজরত থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে জ্বরকে ওযর হিসাবে পেশ করেছিল।

আর তাদের কেউ কেউ তাদের অবস্থার ভাষায় বা মুখের ভাষায় বলে ফেলে যে: আমাদেরকে এর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি!! এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়; কারণ আল্লাহ তা'আলা দুর্ঘটনাগুলোর জন্য কিছু লোককে সৃষ্টি করেছেন।

আন-নাসাকাতুত তারিখিয়্যাহ কিতাবের লেখক উল্লেখ করেছেন: জিহাদ অচল করে দেওয়ার সুরতগুলোর মধ্যে একটি হল মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ উলামাদের জিহাদের ব্যাপারে অবহেলা করা। স্বয়ং এই বিষয়টিই মুসলিম জাতির জিহাদী ইতিহাসের একটি লজ্জাজনক অধ্যায়। অনুরূপ এটাকে মনস্তাত্ত্বিক জিহাদ অচল করার একটি সুরত হিসাবে গণ্য করা হয়।

একারণে আমরা অনেক আহলে ইলমকে দেখতে পাই, তারা মুজাহিদদেরকে এমন নামে উল্লেখ করতে লজ্জাবোধ করে না, যার মধ্যে কোনও না কোনভাবে টিটকারী-টিপ্পনি রয়েছে। যেমন জিহাদী যুবকরা.. জিহাদওয়ালারা.. এই মুজাহিদরা..জিহাদীরা..জিহাদী প্রবণতা... জিহাদী তেজ..ইত্যাদি। এমনিভাবে কম তারবিয়াত, কম ইলম.. ইত্যাদি অভিযোগগুলো করা।

আজ এমন অযোগ্য উত্তরসূরীরা এসেছে, যাদেরকে আমরো দেখি, দাঁড়ি সাদা হয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে জিহাদ করেনি। আর আমরা ধারণা করছি, যুদ্ধ করার সংকল্পও করেনি। কারণ সে কিভাবে নিজের মনে জিহাদের সংকল্প করবে, আমরা তো দেখছি সে মানুষকে জিহাদে যেতে নিষেধ করছে!

কিভাবে ধারণা করা যায় যে, সে জিহাদের সংকল্প করেছে, আমরা তো দেখছি, সে মুজাহিদদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো অনুসন্ধান করছে, খুব জোরে-শোরে সেগুলো ঘাটাঘাটি করছে, তারপর সেগুলোকে বড় করে তুলছে। অপরদিকে তাগুতদের সীমালঙ্ঘন থেকে দৃষ্টি নিচু করে রাখছে, যদি অন্তত: তাদেরকে আলোকিত করে তোলার কাজ না করে।

وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ

"আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না। শুধু মাত্র যা জানতে পেরেছি তা ই। আর আমরা তো অদৃশ্য বিষয়ের সংরক্ষক নই।"

তাদের কেউ যদি শুধু আমাদের জিহাদের বিষয়ে আমাদের সাথে বিরোধিতা করে, কিন্তু তারা তো এমন জিহাদও পেয়েছে, যার ব্যাপারে তারাও একমত। শুধু তাই নয়; তারা যদি জিহাদ করলে তাদের শাসকদের থেকে আশঙ্কা করার কথা বলে, তাহলে তাদের জীবনে তো এমন জিহাদও অতিবাহিত হয়েছে, যাতে শাসকরা বিরোধিতা করতো না। তাদের জীবনে অতিবাহিত হয়েছে রুশদের বিরুদ্ধে আফগানদের যুদ্ধ। অথচ তারা তো আপন অবস্থায়ই আছে।

এর মধ্যে সর্বোত্তম অবস্থা হল, যে অন্তত: জিহাদী খোৎবা দিয়েছে এবং জিহাদী সংবাদ জানার নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েছে।

ইয়ামানে আমি তাদের একজনের সাথে কথা বলছিলাম, সে দালাল সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আমার বিরোধিতা করছিল। তখন আমি তাকে রাফিযীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করা এবং এমন একটি শক্তি গঠনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার আহ্বান জানালাম, যেটা আহলুস সুন্নাহকে রক্ষা করবে। তখন সে শুধু একজন যুবককে বর্শা সহ পাঠিয়েই ক্ষ্যান্ত হল। তারপর আমাকে সেই যুদ্ধের জন্য আহ্বান করল। যেন তার দায়িত্ব ঐ পর্যন্তই শেষ।

এদের অবস্থা খুব আশ্চর্যজনক! যেন জিহাদের অসংখ্য আয়াত ও হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে, জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাওয়ার সময়ও শুধু জিহাদের প্রতি আদেশ করার ব্যাপারে এবং তা পরিত্যাগ করার শাস্তি শুনিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে। এগুলো তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়নি; অন্যদের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে।

নিশ্চয়ই ইলমের সাথে যতক্ষণ আমল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইলমে বরকত হবে না। যে জিহাদের সমস্ত ফযীলতগুলো সনদসহ মুখস্ত করলো, কিন্তু জিহাদ করল না এবং মনে মনে জিহাদের সংকল্পও করল না, সে কিভাবে এই ইলমের বরকত লাভ করবে?

তারা কি জানেনি যে, সাহাবাগণ জিহাদ করা সত্ত্বেও যখন তারা আবেদন করলেন: আমরা যদি জানতাম, কোন আমল উত্তম, তাহল তা করতাম! তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তিরস্কার করে আয়াত নাযিল করেন:

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

"তোমরা কেন যা কর না, তা বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট খুবই অসন্তোষজনক। নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ সকল লোকদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।"

কেউ কি বলতে পারবে যে, এ সকল আয়াতগুলোতে কিতাল (যুদ্ধ) এর মধ্যে মুখের জিহাদও অন্তর্ভূক্ত হবে?

বর্তমানে এমন অযোগ্য উত্তরসূরীরা এসেছে, যারা মনে করে, মুস্তাহাব ইলমের প্রাচুর্য লাভ করাও আল্লাহর পথের জিহাদ থেকে উত্তম।

ইবনুল মুবারক রহ: তার কিতাবুল জিহাদে স্বীয় সনদে আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হুয়াইতিব থেকে বর্ণনা করেন:

তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মালিকের নিকট বসা ছিলাম। ইত্যবসরে শাম থেকে আগত জনৈক শায়খ, যাকে আবু বাহরিয়া বলা হয়, সে দু'জন যুবকের গায়ে ভর দিয়ে তার নিকট প্রবেশ করল। আব্দুল্লাহ তাকে দেখে বললেন: আবু বাহরিয়্যাকে স্বাগতম! অত:পর আমাকে সরিয়ে তাকে জায়গা করে দিলেন।

অত:পর বললেন: হে আবু বাহরিয়াহ! আপনি কি বিষয় নিয়ে এসেছেন? আপনি কি চাচ্ছেন, আমি আপনাকে পাঠানো মূলতবি করি? তিনি বললেন: আমাকে প্রেরণ করা মুলতবি করেন এটা আমি চাই না। বরং আমার এই দুই পুত্রকে গ্রহণ করুন!

তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কে? আমি বললাম: আমি আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হুয়াইতিব। তখন তিনি বললেন: স্বাগতম, মারহাবা তোমাকে হে ভাতিজা! আমি সর্বপ্রথম যে সেনাবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হই, সেটা হচ্ছে ওমর রা: এর যামানায় রোম সাম্রাজ্যের অভিযান। আমাদের আমির ছিলেন তোমার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনুস সা'দী। আমাদের আমিরের নিকট সর্বাধিক যতটুকু অংশ ছিল, তা হল: সূরা নাস, ফালাক ও কিসারে মুফাস্সালের কিছু সূরা। আর আমাদের এমন কোন লোকের সাথেও সাক্ষাৎ হত না, যে আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে বলে ধারণা করা যায়। তবে ভাতিজা! আমাদের মধ্যে গাদ্দারী, মিথ্যা, খেয়ানত ও আত্মসাৎ ছিল না।

তারা কুরআনের কম অংশ জানাকে জিহাদের জন্য বাঁধা মনে করতেন না। বরং সেনাবাহিনী বা কোন দলের আমির হওয়ার জন্যও বাঁধা মনে করতেন না। অথচ আজ এক দল লোক, যে ই জিহাদে বের হওয়ার সংকল্প করছে, তার জন্যই ইলমে ব্যাপক যোগ্যতা থাকা শর্ত করছে। তাদেরকে দেখি, বছরের পর বছর ধরে ইলমী মারকাযসমূহে অব্যাহতভাবে লেগে থাকে। আর সর্বাদই ইলমের প্রয়োজনের মধ্য থাকে, যেটা ছাড়া তাদের মতে জিহাদই সহীহ হবে না।

আমার কথা দ্বারা কেউ যেন কিছুতেই এটা না বুঝে যে, আমি ইলম তলব ও কুরআন হিফজ থেকে বাঁধা দিচ্ছি বা তার মর্যাদা খাট করছি। এটাতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা সর্বোত্তম আমাল। কিন্তু এটা যেন আমাদেরকে জিহাদের ফরজ দায়িত্ব থেকে বিমুখ করে না দেয়। আর উভয় জিনিসের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব।

আজ এমন অযোগ্য উত্তরসূরীরা এসেছে, যারা নিরাপত্তার কথা বলে, এটার গুরুত্বকে ব্যাপক করে দেয় এবং তার প্রকৃত অর্থ নিয়ে তামাশা করে। তারা নিরাপত্তার ব্যাপারে এমন বাড়াবাড়িমূলক কথা বলে, যাতে বোঝা যায় যে, তারা জিহাদের বিপদাপদসমূহের কোন বিপদই প্রতিহত করতে সক্ষম নয়। সামান্য পরিমাণ ভয়-ভীতি সহ্য করার প্রস্তুতি তাদের নেই, যেটা জিহাদের আবশ্যকীয় বিষয়। ফলে এই অক্ষমতা তাদেরকে বাধ্য করেছে শাসকদেরকে আকড়ে ধরতে, যারা নিজেরাও স্বীকার করে নেয় যে, তারা বিশ্বাসঘাতক দালাল।

ভয়, তাদের অনেককে তাগুতদের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হতে উৎসাহিত করে। যখন কোন জিহাদের আহ্বানকারী তাদের কারো নিকট যায়, তখন তাদের উত্তর থাকে:

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

"আমাদের ঘরগুলো অরক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে তা অরক্ষিত নয় বরং তারা শুধু পলায়ন করতে চায়।"

তাদের অনেকের বসে থাকা শুধু অসহায় মুমিনদের সাহায্য না করা ও বিশ্বাসঘাতক শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্তই স্থগিত থাকে না। বরং এই সীমা অতিক্রম করে বিদেশী আগ্রাসী শত্রুদেরকে প্রতিহত করা থেকেও বসে থাকা পর্যন্তও গড়ায়।

যে সকল মুসলিম দেশসমূহে প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদ সৃষ্টি হয়েছে, সে সমস্ত দেশগুলোতে খুজলে দেখা যাবে, অনেক বড় বড় ইলমী ব্যক্তিগণ শুধু উপনিবেশবাদ থেকে দূরে থাকাকেই যথেষ্ট মনে করছে। তাদের কেউ কেউ কিছু দিন যুদ্ধ করার পর চলে গেছে স্থায়ীভাবে বসে থাকার জন্য। আর ফিরে আসার নিয়ত নেই। শুধু নিজস্ব লাইব্রেরী বা হোটেলে থেকে যুদ্ধের খোজ-খবর নেওয়া ও যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ দিয়ে ক্ষ্যান্ত থাকছে।

আজ এমন অযোগ্য উত্তরসূরীরা এসেছে, যাদেরকে আমরা দেখি, তারা দলাদলির যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা করে এবং তা থেকে সতর্ক করে। অথচ এই পরিভাষাগুলো গ্রহণ করে কতিপয় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব থেকে এবং টিভি চ্যানেল থেকে। তারা দলাদলিমূলক যুদ্ধ থেকে এমনভাবে সতর্ক করতে থাকে, যেন আল্লাহর দ্বীরেন মধ্যে বিধিবদ্ধ থাকলেও তারা যুদ্ধ করতে রাজি না।

পরিশেষে, আমি আশ্চর্য হবো না, যদি কেউ এমন কোন প্রবন্ধ লিখে, যাতে আমার বিরুদ্ধে জবাব দিয়ে এমন অসংখ্য উলামাদের নামের তালিকা নিয়ে আসে, যারা তাদের জীবনে কোন যুদ্ধে উপস্থিত হয়নি। উলামাদের মাঝে এমনটা পাওয়া যাওয়াকে আমি অস্বীকার করি না এবং এ দাবিও করি না যে, তারা সংখ্যায় কম।

কিন্তু আমি মুসলমান আলেমদের মধ্যে এমন পাওয়া যাওয়াকে অস্বীকার করি, যারা জিহাদের মর্যাদাকে খাট করে, অথবা মুসলমান দেশসমূহে যুদ্ধ পরিচালনাকারী কাফের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে নিষেধ করে বা মুসলমানদেরকে তাদের পুলিশবাহিনীতে ভর্ত হতে আহ্বান করবে অথবা তাতারদের বিরুদ্ধে বা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, মুসলিম দেশে নিযুক্ত ক্রুসেডারদের দালালদের অনুমতি নেওয়াকে শর্ত করবে,

অথবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে অনুমতি দিবে অথবা শাসকদেরকে অনুমতি দিবে মুসলমানদের একটি গ্রুপকে অবরুদ্ধ করার জন্য কাফেরদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে অথবা (জাযিরাতুল আরব তো দূরের কথা) কোন মুসলিম দেশে কাফেরদের সামরিক আইন প্রতিষ্ঠা করতে অনুমতি দিবে অথবা মুসলমানদের উপর চেপে বসা কাফের শাসকদের আনুগত্য করাকে ফরজ সাব্যস্ত করবে।

কেউ যদি এমনটা দাবি করে, তাহলে তাকে প্রমাণ করতে হবে। আমি এমনটা না পাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে দাবি করছি। অথচ আমাদের যামানায় এমনটা ব্যাপক। বিশেষ করে এই দশকে।

দুই অবস্থার মাঝে তুলনা করুন, তাহলেই উম্মাহর বিকৃতির রহস্য বুঝতে পারবেন। আরো বুঝতে পারবেন যে, এটা এমন বিকৃতি, যার মত অবস্থা উম্মাহ তার ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি। এগুলো এমন বিকৃতি, ঐ সকল যুগে কখনো উম্মাহ যার সম্মুখীন হয়নি। ঐ সকল উলামাদের মনে এমন চিন্তা সামান্য উদয় হয়নি।

একারণেই তাদের কিতাবসমূহে এই সমস্ত বিষয়গুলো দেখতে পাবেন না। এমনকি সম্ভাবনার ভিত্তিতেও না। অথচ তারা অনেক বেশি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন এবং সম্ভাবনাময় মাসআলা আলোচনা করেছেন।